

# সন্তানদের লালন-পালন

تربية الأبناء - اللغة البنغالية



جمعية الدعوة والإرشاد ونوعية الجاليات في الزلفي

Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

تربية الأبناء  
أعدّه وترجمه إلى اللغة البنغالية:  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي  
الطبعة الثالثة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح) شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

تربية الأبناء / شعبة توعية الجاليات بالزلفي

٥٠ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٨-٠٩-٩٩٥٣-٦٠٣-٩٧٨

(النص باللغة البنغالية)

١-التربية الإسلامية ٢-تربية الأطفال أ. العنوان

١٤٢٩/١٤١٥

ديوي ١،٣٧٧

رقم الإيداع : ١٤٢٩/١٤١٥

ردمك : ٨-٠٩-٩٩٥٣-٦٠٣-٩٧٨

من معالم المنهج النبوي في تربية الأبناء

সন্তান প্রতিপালনে মহানবী-ﷺ-এর পথনির্দেশিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قدوة السالكين، وعلى آله

وصحبه أجمعين وبعد:

এটা তারবিয়াতের তথা শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালন সম্পর্কীয় একটি ছোট ব্যাগ, যার উদ্দেশ্য হলো আমাদের সমাজে সন্তান-সন্ততির প্রতিপালনের মান উন্নত করা। তাই এটাই অতীব স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এতে সর্ব প্রথম মিশন হবে সন্তানদের প্রতিপালনের ব্যাপারে নবী করীম-ﷺ-এর নিয়ম-পদ্ধতির কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরা। কারণ,

১। মানুষের মধ্যে কেউ সন্তান প্রতিপালনের এমন কোনো পস্থা পেশ করতে পারিনি, যা তাঁর (নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-এর তরীকা থেকে উত্তম।

২। আমরা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। আর ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল, সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾

[الأحزاب ২১]

“তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।” (আহযাব ২১)

৩। আমাদের অনেকই সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের ব্যাপারে নবী করীম-ﷺ-যে তরীকা-পদ্ধতি দিয়েছেন, তা থেকে অনেক দূরে।

প্রথম পথনির্দেশনাঃ আকীদার যত্ন নেওয়া

লালন-পালনকারী প্রত্যেক মুসলিমের এটাই হলো, প্রথম দায়িত্ব। আর এটাই হলো সেই উদ্দেশ্য, যার কারণে মহান আল্লাহ মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টি করেছেন। যেমন, তিনি বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذريات ٥٦]

“আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।” (যারিয়াত ৫৬) এরই জন্য সমস্ত নবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل]

“অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো ও তাগূত থেকে দূরে থাকো।” (নাহল ৩৬) আর নবী করীম-ﷺ-সন্তানদের অন্তরকে সেই আল্লাহর সাথে জোড়ার ব্যাপারে অতীব তৎপর ছিলেন, যিনি এক ও একক, যাঁর কোনো শরীক নেই। যেমন, ইবনে আব্বাসকে বলা তাঁর উক্তি থেকে ফুটে উঠে, যখন তিনি ছোট শিশু ছিলেন। (তিনি বলেন,)

((احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللَّهَ تَحِذْهُ مَجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا

أَسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِينَ بِاللَّهِ، تَعَرَّفَ إِلَيْهِ فِي الرَّحَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشُّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ  
 الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ،  
 وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ،  
 وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ)) [رواه أحمد والترمذي]

“আল্লাহর (নির্দেশাবলীর) রক্ষণাবেক্ষণ ও অনুসরণ করো, আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আল্লাহর অধিকার আদায় করো, তাঁকেও তোমার সাথে পাবে। যখন কোনো কিছু চাইবে, তখন তা আল্লাহরই কাছেই চাইবে। আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। সুদিনে আল্লাহকে মনে রেখ, তাহলে দুর্দিনে তিনি তোমাকে মনে রাখবেন। জেনে রেখ, যদি সমস্ত উম্মত একসাথে মিলে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবে যতটা আল্লাহ তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন, ততটা ছাড়া কোনো উপকার করতে পারবে না। অনুরূপ তারা যদি একসাথে মিলে তোমার কোনো অপকার করতে চায়, তবে যতটা আল্লাহ তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন, ততটা ব্যতীত কোন অপকার করতে পারবে না। আর জেনে রেখ, সাহায্য আসে ধৈর্যের মাধ্যমে এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আসে কষ্টের পর।” (আহমদ, তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)। এইভাবে তিনি-ﷺ-সন্তানদের আকীদা শিক্ষা দেওয়ার প্রতি যত্ন নিতেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা অনেকেই আকীদার ব্যাপারটা ভুলেই থাকি। আর

এই আকীদারই অন্তর্ভুক্ত বিষয় ভাগ্য এবং প্রত্যেক ব্যাপার যে মহান আল্লাহর হাতে, তার শিক্ষাও তারবিয়াতদাতারা সন্তানদের দেয় না।

দ্বিতীয় পথনির্দেশনাঃ নামাযের যত্ন নেওয়া

নবী করীম ﷺ-এর তারবিয়াতের পদ্ধতি দেখুন! তিনি বলেছেন,  
 ((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ  
 أَبْنَاءُ عَشْرٍ)) [أحمد وأبو داود]

“সন্তানদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স হবে সাত বছর এবং এই নামাযের জন্যই তাদের প্রহার কর যখন তাদের বয়স হবে দশ বছর।” (আহমদ, আবু দাউদ, হাদীসটি সহীহ)। নবী করীম-ﷺ-এর সুন্নতে সন্তানদের প্রহার করার এ রকম নির্দেশ অন্য কোথাও এসেছে কি? আমার জানা মতে আসেনি। আর নামাযের জন্য মারার নির্দেশ তার মাহাত্ম্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই এসেছে। আর প্রহার করার এ কথা এসেছে পার্থক্যবোধ আছে এমন সন্তানকে নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়ার এক হাজার একশত নব্বই (১১৯০) দিন পর। আর এই নির্দেশের এই সময়ের মধ্যে পুনরাবৃত্তি ঘটবে নামাযের সংখ্যা অনুপাতে প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শত (৫৬০০)বার। সেই সাথে সন্তান অনেক সময় তার পিতা-মাতাকে তার সামনে নামায পড়তেও দেখবে। সন্তানদের বিপথগামী ও অবাধ্য হওয়া এবং পঠনে-পাঠনে তাদের অসফলতা ইত্যাদির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে নামায পড়ার ও

তার যত্ন নেওয়ার ও না নেওয়ার সাথে। সন্তানদের সংস্কার এবং পঠন-পাঠনে তাদের সফলতার ব্যাপারে নামাযের যে কত প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এর উপর যদি জ্ঞানগর্ভমূলক গবেষণা করা হয়, তবে এমন বিশ্বাসযোগ্য ফল বের হবে যে, তা উন্নতি ও সফলতার সাথে নামাযের ব্যাপক অর্থের সাথে সরাসরি সম্পর্ক থাকার কথা প্রমাণ করে দিবে।

তৃতীয় পথনির্দেশনাঃ চিকিৎসার চেয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম  
 চিকিৎসার পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করাও সন্তানদের তারবিয়াতের একটি তরীকা ছিলো নবী করীম-ﷺ-এর। আর এটা আত্মাহর অনুমতিক্রমে সন্তানদের বিপদে পড়ার মাঝে হবে রক্ষাকারী বেড়া। বর্তমানে এটাই আমাদের বড় ভুল যে, সতর্কতা অবলম্বন করার ব্যাপারে উদাসীন। যখন সন্তানরা বিপদে পড়ে যায়, তখন আমরা টের পাই এবং এর চিকিৎসার জন্য প্রচেষ্টা করি। এ প্রসঙ্গটা বুঝার জন্য আমাদের সামনে রয়েছে দশ বছরের সন্তানদের ক্ষেত্রে বলা নবী করীম-ﷺ-এর এই (وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) উক্তি এবং ফায়ল ইবনে আব্বাসের চেহারাকে তাঁর অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা। তিনি ছোট ছিলেন। তাঁকে নবী করীম-ﷺ-সাওয়ারীর পিছনে বাসিয়ে ছিলেন। এ সময় খাসআমী গোত্রের একটি মহিলা নবী করীম-ﷺ-কে কিছু জিজ্ঞেস করতে এলে ফায়ল ইবনে আব্বাস তার দিকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকিয়ে থাকলে তিনি-ﷺ-তাঁর চেহারাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

সতর্কতা অবলম্বন করার ব্যাপারে এমন উদাসীনতা যে, ছেলে-মেয়েরা

অতীব অনিয়মভাবে টি ভি চ্যালেনে আগত বিষয় পরিদর্শন করতে থাকে। তাতে আগত অনেক বিষয় তো চিন্তা-চেতনা ও নৈতিকতার জন্য অতীব বিপদজনক হয়। কোন নিয়ম ছাড়াই ইন্টারনেটের মাধ্যমে যার সাথে চায় সম্পূর্ণ যোগাযোগ রাখে। মোবাইল ফোন সব সময় চালু থাকে এ সবে প্রতী কোনই নজর থাকে না। এ সব কার্যকলাপ থেকে সতর্কতার জন্য নবী করীম-ﷺ-এর তরীকার অনুসরণ করা হয় না। এই জিনিসগুলো ব্যবহার করার ব্যাপারে বয়সের প্রতি খেয়াল রাখাও অতীব প্রয়োজন। যেমন, ইন্টারনেট ছেলে-মেয়েদের শোয়ার ঘরে কেন থাকে, কোন নজরদারী ছাড়াই সব সময় কেন তা ব্যবহার করা হয়, হলো (বড়) ঘরে কেন রাখা হয় না যেখানে সবাই ব্যবহার করবে এবং পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড (সাংকেতিক শব্দ) কি তা জানবে সান্ত্বনা এবং নজরদারীর জন্য, সেই সাথে তুষ্টকর বাদানুবাদের মাধ্যমে এই পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে?

চতুর্থ পথনির্দেশনাঃ পরস্পরের মধ্যে আলোচনার সুযোগ দেওয়া আমাদের কারো ছেলে যদি কোনো দিন তার পিতাকে এসে বলে, আমাকে মদ খাওয়ার অথবা হিরোইন ব্যবহার কিংবা ব্যভিচার করার অনুমতি দিন (আল্লাহর কাছে এ থেকে পানাহ চাই), তাহলে তার প্রত্যুত্তর কি হবে বলে মনে কর? অনেক ছেলেরা যারা এ সবে ব্যাপারে এবং এই ধরনের অন্য ব্যাপারেও চিন্তা করে, তারা এ কথা তাদের পিতাদেরকে

কাছে প্রকাশ করে না, বরং তাদের সাথীদের কাছে যায় এবং তারা জ্ঞানের দুর্বলতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে তাদেরকে এ কাজের উপর সাহায্যও করতে পারে। কিন্তু নবী করীম-ﷺ-বিভিন্নভাবে (এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে) অনুরূপ জিনিস চাওয়া পদ্ধতি গ্রহণ করেন। যেমন, ইমাম আহমদ (রহঃ) আবু উমামা-رضী-থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক যুবক নবী করীম-ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। সাহাবাগণ তার প্রতি অগ্রসর হয়ে তাকে ধমকাতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, “ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। সে তাঁর (রাসূলুল্লাহর) কাছে এলে তাকে তিনি বসতে বললেন। সে বসলো। তখন তিনি-ﷺ-বললেন, (এই কাজটা) তুমি কি তোমার মায়ের জন্য পছন্দ করবে? সে বললো, আল্লাহর শপথ! না। আমাকে আল্লাহ আপনার জন্য কুরবান করুন! তিনি-ﷺ-বললেন, অনুরূপ (অন্য) মানুষরাও তাদের মায়ের জন্য তা পছন্দ করে না। তুমি কি তা তোমার বোনের জন্য, তোমার মেয়ের জন্য এবং তোমার ফুফু ও খালার জন্য পছন্দ করবে----।” যুবক পূর্বের উত্তরেরই পুনরাবৃত্তি করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-স্বীয় হাত তাঁর উপর রাখলেন এবং বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি এর পাপকে মার্ফ করে দাও, এর অন্তরকে পবিত্র করে দাও এবং এর লজ্জাস্থানের হেফায়ত কর।” (আহমদ)

লক্ষ্য করুন, এখানে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যুবকের চিন্তার ধরনেরই পুনরাবৃত্তি করে তার সামনে এমন দিকগুলো তুলে ধরলেন, যে বিষয়ে যুবকের

কোনো লক্ষ্যই ছিল না। যুবক যদি এ কথা না জানতো যে, নবী করীম-  
 ﷺ বদানুবাদের সম্পূর্ণ সুযোগ ও স্বাধীনতা দেন, তাহলে সে সৃষ্টির  
 সর্বাধিক পবিত্র মানুষটির কাছে ব্যভিচারের অনুমতি চাইতো না। অপর  
 দিকে এক পিতা তার নবযুবক ছেলেকে যার বয়স ১৬ বছরের বেশি  
 নয় ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয় কেবল এই জন্য যে, সে ‘আমি স্বাধীন’  
 বলার সাহসিকতা প্রদর্শন করেছে, যখন তার কাছে পিতা বাড়ী ফিরতে  
 দেরী হওয়ার কৈফিয়াত তলব করেছে। সে সেখান থেকে বিতাড়িত  
 হয়ে কোনো আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় নিয়ে কয়েক দিন লাগাতার সেখানে  
 কাটায়। অতঃপর পিতা ও ছেলের মাঝে মীমাংসা হয়, কিন্তু এটা হয়  
 সেই প্রগাঢ় সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ার পর, যা স্পষ্ট বাদানুবাদের উপর  
 পিতা ও ছেলের মাঝে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ছেলে ভুল করেছিলো এ কথা  
 ঠিক, কিন্তু পিতার ভুল তার থেকেও বড়। বর্তমানে আমরা ছেলেদের  
 সাথে বাদানুবাদ ও বুঝাপাড়ার অনেক মুখাপেক্ষী, তবে তা হবে সেই  
 মুহাম্মদী তরীকায়, যার কিছু আলোচনা (পূর্বে) হয়েছে। ফেরাউনের  
 তরীকায় নয়, যে বলতো,

﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [غافر ٢٩]

“আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বলছি। আর আমি তোমাদেরকে  
 কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি” (মু’মিন ২৯) যে তরীকায় ছেলেদের  
 উপর নিজেদের ইখতিয়ারাতগুলো কেবল চাপিয়ে দেওয়া হয়, তারা  
 তা গ্রহণ করতে পারে না।

পঞ্চম পথনির্দেশনাঃ মধ্যমপন্থী কৈফিয়াত তলব

হিসাব ও কৈফিয়াত চাওয়ার ব্যাপারে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। কেউ তো ছেলেদের (একেবারে ছেড়ে দিয়ে) নষ্ট করে দেয়। তাদের কোনো কৈফিয়াতই নেয় না, এটাও নিন্দনীয় ও বাড়াবাড়ি। আবার কারো অভ্যাসই হলো সে ছোট-বড় সব কিছুই কৈফিয়াত তলব করে, এ রকম হিসাব নেওয়াও চরম নিন্দনীয় ও বাড়াবাড়ি। আর এ ব্যাপারে নবী করীম-ﷺ-এর পদ্ধতিকে গ্রহণ করাই হলো (বাড়াবাড়ি ও অতি বাড়াবাড়ির মাঝে) মধ্যম পথ। তিনি অল্প বয়সের ছেলেদের ভুলের কৈফিয়াত তলব করতেন এমন পন্থায়, যাতে না থাকতো বাড়াবাড়ি, না অতি বাড়াবাড়ি। আর এই হিসাব ও কৈফিয়াত তলবও একই নিয়মে হতো না, বরং ভুলের ভিন্নতা এবং তা কত মারাত্মক সেই অনুপাতে তাঁর কৈফিয়াত তলবও ভিন্ন হতো। ভুলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হঠকারিতা প্রদর্শন করে, না তা থেকে তাওবা করে? সে তা অজানতে করেছে, না জেনেশুনে? এ সবে প্রতীতিও তিনি খেয়াল রাখেন। দেখুন, তিনি অল্প বয়সের যুবক মুআ'য ইবনে জাবাল কাছে কৈফিয়াত তলব করেছেন। কারণ, তিনি লোকদের নামায পড়াতেন এবং নামাযকে অতি লম্বা করতেন। তাই তাঁকে বললেন, ((رواه أحمد)) "تُؤمِّي كَيْفِيَاةً أَنْتَ يَا مُعَاذُ" "তুমি কি মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করতে চাও হে মুআ'য।" তিনি তাঁর ভুলের কথা জেনে চুপ থাকেন নাই এবং তাঁর উপর তাঁর সাধ্যাতীত কোনো জিনিস চাপিয়েও দেন নাই। আবার কখনো তিনি চুপ থেকেই ক্ষান্ত

হতেন এবং ক্রোধের নিদর্শন তাঁর চেহারায় ফুটে উঠতো। যেমন, আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, তিনি একটি বালিশ কিনে ছিলেন যাতে ছবি ছিলো। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তা দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, প্রবেশ করলেন না। আয়েশা রাযীআল্লাহু আনহা বললেন, আমি তাঁর চেহারায় অপছন্দের ভাব বুঝতে পেরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাভর্তন করছি, বলুন, আমার ভুল কি হয়েছে? তিনি বললেন, এই বালিশটার ব্যাপার কি? অপর দিকে তিনি উসামা-رضী-এর ব্যাপারে কঠোর পদ্ধতি গ্রহণ করেন। যখন একদা তিনি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন। কিছু মানুষ চুরির দায়ে ধরা পড়া মাখযুমীয়া গোত্রের মহিলার হাত যাতে কাটা না যায় সে ব্যাপারে নবী করীম-ﷺ-এর কাছে সুপারিশ করার জন্য তাঁর মধ্যস্থতা গ্রহণ করেছিল। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন, “তুমি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করছো।” (বুখারী)

ষষ্ঠ পথনির্দেশনাঃ তাদেরকে আত্মনির্ভরতার সুযোগ দেওয়া

আমরা যদি অল্প বয়সী এই ছেলেদের আত্মনির্ভরতা দুর্বল হওয়ার অভিযোগ করি অথবা পাশ্চাত্যের ছেলেদের যে আত্মনির্ভরতা এবং নিজেদের মনের অভিপ্রায়কে ফুটিয়ে তুলার তাদের যে যোগ্যতা, তার সাথে যদি আমাদের ছেলেদের তুলনা করি, যাদের অনেকের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকে না, তবে আমাদের কর্তব্য নবী করীম-

ﷺ-এর তারবিয়াতের মাদরাসায় যাওয়া, যেখানে এই রোগের বাস্তব চিকিৎসা করা হয়। অবশ্যই আমার ও আপনার ছেলের আত্মনির্ভরশীল হওয়া তার নিজের প্রতি সম্মান বোধ ও তার গুরুত্বের প্রতি অনুভূতির জন্ম দিবে। কিন্তু এই অনুভূতি সৃষ্টি হবে কেমনে আমরা তো অনেক সময় তার কোনো গুরুত্ব ও সম্মান আছে বলে মনেই করি না। আমরা কি তাদেরকে তাদের নিজস্ব ব্যাপার ব্যক্ত করার অনুমতি ও তাদের কোন ইখতিয়ারের সুযোগ দেই এবং তাদের বিশেষ ব্যাপারে তাদের থেকে অনুমতি চাই? নাকি দমন ও তুচ্ছ জ্ঞাপন ক’রে এবং তাদের নিজস্ব ব্যাপারে তাদের মতামতের কোনো মূল্য না দিয়ে আমাদের প্রভুত্বই তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়? আর এটাকেই গবেষকদের কেউ কেউ ‘নীরব’ সাংস্কৃতির নাম দিয়েছে। নবী করীম-ﷺ-কে এক পিয়াল দুধ পেশ করা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডান পাশে ছিলো একটি বালক এবং তাঁর বাম পাশে ছিলো কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। তাই তিনি বালকটিকে বললেন, “তুমি কি অনুমতি দিচ্ছে যে, এটা (দুধের পিয়াল) আমার বাম পাশে যারা তাদের দিয়ে দিই?” বালকটি বললো, না, আল্লাহর শপথ! আপনার নিকট থেকে প্রাপ্ত আমার অংশের উপর আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তার ডান হাতে তা রেখে দিলেন।” (বুখারী-মুসলিম) এই ঘটনায় তারবিয়াত সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন চারটি জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে সন্তানদের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং

তাদের গুরুত্বের প্রতি অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রথমতঃ কিভাবে বালকটি নবী করীম-ﷺ-এর পাশে বরং সরাসরি তাঁর ডান পাশে বসার সুযোগ লাভ করলো, অথচ তিনি হলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং সেখানে রয়েছেন কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ লোক?

দ্বিতীয়তঃ যখন নবী করীম-ﷺ-পান করার পর বালকটির কাছে অনুমতি চাইলেন যে, সে তার প্রাপ্ত অংশ পরিত্যাগ করবে কি না, তখন তার মধ্যে কেমন আত্মনির্ভরতার সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও ব্যাপারটা অতি বড় ও কোনো মৌলিক বিষয় নয়?

তৃতীয়তঃ নবী করীম-ﷺ-এর শিক্ষার আদর্শে শিশুদের আত্মনির্ভরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তাঁর চাওয়াকে দৃঢ়চিত্তে প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হয় এবং তার উপযুক্ত কারণও বর্ণনা করে?

চতুর্থতঃ প্রতিপালনের ব্যাপারে কথার চেয়ে কর্ম বেশি কার্যকরী হয়। তাই (হাদীস) বর্ণনাকারী বলেন, তিনি-ﷺ-পিয়ালার তার ডান হাতে রেখে দিলেন। অর্থাৎ, তাকে পরিতুষ্ট এবং তার মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দুধের পিয়ালার তাকে দিয়ে দিলেন।

নবী করীম-ﷺ-এর শিক্ষানিতিতে সন্তানদের গুরুত্বের কেবল অনুভূতি দেওয়া পর্যন্ত ব্যাপার সীমিত ছিল না, বরং তাদের আত্মনির্ভরতা তাদের মধ্যে স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের বাস্তব দক্ষতারও জন্ম দিয়েছিল। মুআ'য ইবনে জাবাল-رضী-লোকদের নামায পড়াতেন, অথচ তিনি ছোট ছিলেন। কারণ, এই কাজ তাঁর যোগ্যতা উপযোগী

ছিলো। উসামা ইবনে যায়েদ-رضী-সৈন্যদলের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন, অথচ দলে তখন বড় বড় সাহাবাগণও ছিলেন। আর তখন তাঁর বয়স ১৭বছর অতিক্রম করেনি ছিলো। কেন জানেন? যাতে তাঁর মধ্যে আত্মনির্ভরতার সৃষ্টি হয় এবং পরে সমাজ তা থেকে উপকৃত হয়।

এঁদের পূর্বে আলী ইবনে আবু তালেব-رضী-হিজরতের রাতে নবী করীম-ﷺ-এর বিছানায় শুয়ে এমন গুরুতর দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যাতে প্রয়োজন ছিল সাহসিকতা ও ত্যাগের। এইভাবে আরো অনেকেই। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অনেকের অবস্থা হল এই যে, সন্তানদের উপর আমরা কোনো ভরসাই রাখি না এবং সামান্য কোন দায়িত্ব পালনের ভারও তাদেরকে দিই না।

সপ্তম নির্দেশনাঃ উত্তম নৈতিকতার প্রতি দিকনির্দেশনা

সন্তানরা পথপ্রদর্শনের মুখাপেক্ষী। কারণ, তাদের অভিজ্ঞতা স্বল্প। তাছাড়া অন্তর ও বিবেক সাধারণতঃ নির্দেশনা ও শিক্ষা গ্রহণের কেন্দ্রস্থল। তাই তো নবী করীম-ﷺ-এর সন্তানদের শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠিত ছিলো তাদেরকে যাবতীয় আদব ও উত্তম নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার উপর। এইমর্মে তাঁর উক্তিগুলো নিম্নরূপঃ

তিনি-ﷺ-হাসান ইবনে আলী-رضী-কে বলেছিলেন যখন তিনি ছোট শিশু ছিলেন।

(( دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصُّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكُذْبَ رِيْبَةٌ ))

رواه الترمذي وصححه الألباني

“তোমার কাছে যা হালাল তথা বৈধ হওয়াতে সন্দেহ জাগে, তা বর্জন করে এমন জিনিস গ্রহণ করো, যাতে সন্দেহ নেই। নিঃসন্দেহে সত্য-বাদিতার (ফল) প্রশান্তি এবং মিথ্যাবাদিতার (পরিণতি) সন্দেহ।” (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ)। (নবী করীম-ﷺ-এর) এই উক্তি কে হাসান-ﷺ-মুখস্থ করে নিয়ে ছিলেন এবং শিশুকাল থেকেই তা তাঁর মাথায় সৃঢ়ভাবে গেঁথে ছিলো। তিনি নব যুবক ইবনে উমার-رضী-কে বলেন,

((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَبِيلٍ)) رواه البخاري

“দুনিয়ায় এমনভাবে থাকো যেন তুমি অপরিচিত অথবা মুসাফির।” (বুখারী) শিশু আমার ইবনে আবু সালামা-رضী-এর হাত প্লেটে এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করলে তিনি তাঁকে বলেন,

((يَا غُلَامُ سَمَّ اللَّهُ وَكُلَّ بَيْمِينِكَ وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ))

“হে বৎস! ‘বিসমিল্লা-হ’ বলে ডান হাতে নিজের দিক থেকে খাও।” (বুখারী-মুসলিম) অনুতাপের বিষয় এই যে, অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে আদব ও উত্তম নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়ার প্রতি যত্ন খুব কমই নেয়। কখনো কখনো তা শূন্যের ঘরে পৌঁছে যায়। যেমন, তাকে তার সাথী-সঙ্গীদের সাথে চরম কলহ করতে দেখে অথচ তাকে কিছুই বলে না। অথবা সে তাদের থেকে একেবারে পৃথক থাকে তখনও তাকে কিছুই বলে না। এ ছাড়া আরো অনেক আচার-আচরণ যার চিকিৎসার ও সঠিক দিকনির্দেশনার প্রয়োজন থাকে।

অষ্টম নির্দেশনাঃ উত্তম নৈতিকতার প্রতিদান দেওয়া

আদব ও উত্তম আচার-আচরণের শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে শিশুদের ইতিবাচক কর্ম ও সুন্দর নৈতিকতার জন্য দুআ ক’রে ও প্রশংসার দ্বারা তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া ও তাদের মনোবল বাড়ানোও অত্যাবশ্যিক। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস-رضي الله عنه-থেকে তাঁর শিশুকালে নবী করীম-صلى الله عليه وسلم-এর নিকট রাত্রি যাপন করার ঘটনায় এসেছে, তিনি বলেন, নবী করীম-صلى الله عليه وسلم-পায়খানায় প্রবেশ করলে আমি তাঁর জন্য অযূর পানি রেখে দিলাম। তিনি পানি কে রাখলো এ কথা জিজ্ঞেস করলে তাঁকে তা জানানো হলো। তিনি তখন বললেন,

((اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوْبِيلَ)) [متفق عليه]

“হে আল্লাহ! তুমি ওকে দ্বীনের তত্ত্ব জ্ঞান ও সঠিক ব্যাখ্যা উদঘাটনের মেধা দান করো।” বুখারী-মুসলিম) নবী করীম-صلى الله عليه وسلم-এই মহান দুআ শিশু ইবনে আব্বাসের জন্য ইতিবাচক কৃত কর্মের প্রতিদান ছিল এবং সুন্দর আচরণের প্রতি তাঁকে আরো দৃঢ়করণের প্রেরণা। অনুরূপ তিনি-صلى الله عليه وسلم-সুন্দর আচরণ ও উত্তম নৈতিকতাকে সুদৃঢ় করেছেন জা’ফার ইবনে আব্বাস-رضي الله عنه-মধ্যে তাঁর এই উক্তি দ্বারা, “তুমি সৃষ্টিগত গঠন ও চারিত্রিক দিক দিয়ে আমার মতনই।” (বুখারী) এইভাবে যখন নব যুবক মুআ’য ইবনে জাবাল-رضي الله عنه-এর মধ্যে সুন্নত ও নবীর মজলিসে উপস্থিত থাকার প্রতি বড়ই আগ্রহ দেখলেন, তখন তাঁকে সুদৃঢ় করার জন্য বলেন, “হে মুআ’য! আমি আল্লাহর নিমিত্ত তোমাকে ভালোবাসি।”

(নাসায়ী, হাদীসটি সহীহ)। এই সাহস ও হিম্মত দান মুআ'যের মনে বড়ই প্রভাব ফেলেছিলো। বর্তমানে আমাদের অনেকে তার শিশুকে অনেক উৎকৃষ্ট কর্ম সম্পাদন এবং সুন্দর ব্যবহার পেশ করতে দেখে কিন্তু তাকে সাহস ও হিম্মত দান করে না। কারণ, সে এটাকে প্রাকৃতিক ব্যাপার মনে করে। অথচ এর বিপরীত করলে তাকে ধমক দেয়। যেমন, বড়দের মর্যাদা ও সম্মান দান, পড়ায় উন্নতি লাভ এবং নামায, সততা ও আমানতের প্রতি যত্নবান হওয়া ইত্যাদি।

নবম নির্দেশনাঃ তাদের মধ্যে এই অনুভূতি জন্মানো যে তুমি তাদেরকে ভালোবাসো

প্রথমতঃ পিতা-মাতা এবং যে তারবিয়াতের ভার গ্রহণ করে তার পক্ষ হতে শিশুকে ভালোবাসার, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করার এবং তাকে গ্রহণ করার অনুভূতি জন্মানো এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনসমূহের অন্তর্ভুক্ত যে, তা না হলে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে বাধা সৃষ্টি হয়। তাই তো নবী করীম-ﷺ-এই প্রয়োজনটা শিশুদের মনে খুব ভালোভাবে প্রবেশ করাতেন। যেমন, বুখারী শরীফে এসেছে যে, তিনি শিশু হাসান ইবনে আলীকে কোলে নিয়ে বললেন,

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ)) [رواه البخاري]

“হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, অতএব তুমিও একে ভালোবাসো এবং একে যে ভালোবাসে, তাকেও তুমি ভালোবাসো।” (বুখারী) আকরা ইবনে হা-বিস-ﷺ-যখন নবী করীম-ﷺ-এর কাছে প্রবেশ ক'রে দেখলেন

যে, তিনি হাসান ইবনে আলীকে চুম্বন করছেন, তখন তিনি (আক্ফরা) বললেন, আপনি শিশুদের চুমা খান? আমার তো দশটি সন্তান আছে তাদের কারো কোনো দিন আমি চুমা দেইনি। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ বললেন,

((أَوْأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ)) [متفق عليه]

“আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়াকে তুলে নিয়ে থাকেন, তাহলে আমি তার মালিক বা জিস্মাদার।” (বুখারী-মুসলিম) তিনি-ﷺ-এমন সুবিজ্ঞ তারবিয়াতদাতা ছিলেন যে, আক্ফরা ইবনে হা-বিস-ﷺ-এর প্রতিবাদ করলেন এমন বিস্ময়জনিত বাক্যের দ্বারা, যা উত্তরের চেয়েও কার্যকরী ছিলো। আর যার সারমর্ম হলো, সে দয়া শূন্য, যে ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং তাদেরকে ভালোবাসার অনুভূতি দেয় না। এই সেই দয়া, যার বিলুপ্ত হওয়ার ভয় দেখিয়েছেন নবী-ﷺ-করীম ছোটদের সাথে সুন্দর আচরণ পেশ না করলে। যেমন, তিনি বলেন,

((كَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا)) [رواه أحمد و أبو داود والترمذي]

“সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের শিশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না।” (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) আর এই দয়ায় নবী করীম-ﷺ-কে কাঁদিয়ে ছিলো যেদিন তাঁর ছোট ছেলে ইব্রাহীম মারা গিয়ে ছিলো। তখন তিনি বলেছিলেন,

((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَجْزُنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا

إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ)) [رواه البخاري]

“চোখ অশ্রু বারায় এবং অন্তর ব্যথিত হয় তবে আমরা তা-ই বলি যাতে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হোন। হে ইব্রাহীম, আমরা তোমার বিচ্ছেদে অবশ্যই মর্মান্বিত।” (বুখারী) তারবিয়াত ও দয়ার কি তৃপ্তিই না হাসান ও হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহুমা) অনুভব করেছিলেন যখন তাঁরা নবী করীম-ﷺ-কে তাঁদের সম্পর্কে এ কথা বলতে শুনেছিলেন, “এঁরা দুনিয়াতে আমার দুটি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবিশেষ।” (বুখারী)

পক্ষান্তরে আমাদের অনেকে ছেলেদের জন্য ভালোবাসা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা ব্যক্ত করা হতে বিরত থেকে লালন-পালনের ব্যাপারে ভুল ও দয়াশূন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কারণ, তাদের ধারণা হলো যে, এতে তারা অতিশয় প্রশংসিত পাবে এবং তার উপর বড়ত্ব দেখাবে। অথবা এটা ছেলেদের তারবিয়াত এবং তাদের জীবন তৈরীর ক্ষেত্রে উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ তাদের আদর করা এবং তাদের সাথে শিশুসুলভ আচরণ ক’রে তাদের মনজয় করাঃ

এই দিকটার প্রতি যত্ন নেওয়ায় একদিন নবী করীম-ﷺ-কে সাজদায় বিলম্ব করতে বাধ্য করেছিল যখন তিনি সাহাবাদেরকে নামায পড়াচ্ছিলেন। কেন জানেন? কারণ, ছোট শিশু হাসান ইবনে আলী-رضী-তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসেছিলেন। তাই তিনি চান নাই যে এই মুহূর্তে নবীর সাথে তাঁর তৃপ্ত হওয়াতে বিচ্ছেদ ঘটুক। তাই তিনি নামায শেষে লোকদের বললেন যে,

[ (ابنِ هَذَا ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجَلَهُ ) (رواه أحمد والنسائي) ]

“আমার এই ছেলেটা আমার উপর চড়ে বসেছিলো তাই তাকে আমি ত্বরান্বিত করতে পছন্দ করেনি।” এখন প্রশ্ন হলো বর্তমানে এই ধরনের কোনো কাজ যদি আমাদের মসজিদের কোনো ইমামের সাথে সংঘটিত হয়? সে কি করবে? আর সে যদি নবী করীম-ﷺ-এর অনুকরণ ক’রে ছোট শিশুর প্রতি খেয়াল রেখে সাজদা সুদীর্ঘ করে, তবে মুসাল্লীরা তার এই আচরণের প্রতিবাদ কিভাবে করবে?

তিনি-ﷺ-এইভাবে ছোট শিশুদের আদর করতেন, এমন কি নামাযেও। আর নামাযে থাকা অবস্থায় তিনি যদি এই আচরণ করেন, তবে নামাযের বাইরে তাঁর ছোটদের আদর ও তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করার ব্যাপারে আমাদের আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। একদা তিনি একটি শিশুর জন্য তাঁর জিভ বের করেন এবং শিশু তাঁর জিভের লাল আভা দেখতে পায়। (ইবনে হিব্বান) তিনি কখনো কখনো কোনো কোনো শিশুদের বলতেন যে, “যে আগে আমার কাছে আসতে পারবে, তার জন্য এই (পুরস্কার)।” (আহমদ) আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ছোটদের আদর ও তাদের সাথে শিশুসুলভ আচরণ করা তাদের মনে তারবিয়াত সংক্রান্ত বিরাট প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ফেলে। কেননা, তারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তার কথা গ্রহণ করে, যে তাদেরকে আদর করে। আর যে আদর করে না, তার কথা তারা গ্রহণ করে না।

দশম নির্দেশনাঃ ছেলেদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা

পিতা-মাতার পক্ষ হতে আচার-আচরণে পার্থক্য করণের ব্যাপারে

শিশুরা চরম অনুভূতিশীল। আর অনেক ক্ষেত্রে ভাইদের পারস্পরিক বিচ্ছেদ এবং আপসে তাদের হিংসা-বিদ্বেষের মূল কারণ হয় পিতাদের ছেলেদের মাঝে সমতা বজায় না রাখা। বড়ই আশঙ্কাজনক ব্যাপার এই যে, পিতারা ছেলেদের মধ্য হতে কেবল একজনকে ভালোবাসলে এটা অন্য ছেলেদেরকে তার ঐ ভাইয়ের শত্রুতে পরিণত করবে। যেমন, ইউসুফ-عليه السلام-এর ভাইদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তাদের এই ভুল ধারণা হয়েছিলো যে, তাদের পিতা ইউসুফ-عليه السلام-কে তাদের উপর প্রাধান্য দেন। তাই তারা বললো,

﴿لْيُؤَسِّفْ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ [يوسف ٨]

“অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটি (সংহত) দল।” (সূরা ইউসুফ ৮) আর এই ভুল ধারণা তাদেরকে তাদের ভাইয়ের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ সম্পাদনের দিকে নিয়ে গেলো। তারা বলল,

﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ﴾ [يوسف ٩]

“হত্যা করো ইউসুফকে অথবা ফেলে এসো তাকে অন্য কোনো স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে।” (ইউসুফ ৯) যে জিনিস তাদেরকে (নিকৃষ্টতম) এই আচরণ সম্পাদন করতে বাধ্য করেছিলো তা হলো, ইউসুফ-عليه السلام-কে ধ্বংস ক’রে পিতার ভালোবাসা ও তাঁর মনোযোগ লাভ করা।

কোনো এক পিতা সম্পর্কে বলা হয় যে, সে তার দুই ছেলেকে বাড়ির বাইরে রাতে আমোদ-প্রমোদের জন্য নিয়ে যায়। তারা এক লম্বা ফিল্ম চালিয়ে তৃপ্তি গ্রহণ করছিলো ইত্যবসরে তার আট বছরের ছোট ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন পিতা তাকে তার কোর্ট দিয়ে ঢেকে দেয়। বৈঠক শেষে পিতা তাকে (কোলে)তুলে নিয়ে গাড়ীতে নিয়ে যায়। গাড়ী করে বাড়ী ফিরার সময়ে তার বার বছরের বড় ছেলেকে ফিল্মের উপকারিতা সম্পর্কে কিছু না বলে অন্যমনস্ক হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি ফিল্ম দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছে? ছেলের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কহীন উত্তরে পিতা ঘাবড়িয়ে যায়, তুমি কি আমাকেও আমার ছোট ভাইয়ের মত ঐভাবে তোমার কোর্ট দিয়ে ঢেকে দিতে, যদি আমি ফিল্ম দেখার সময় ঘুমিয়ে পড়তাম? এই জন্যই যখন নো'মান ইবনে বাশীর-رضي الله عنه-এর পিতা নবী করী-صلى الله عليه وسلم-এর কাছে এসে তাঁকে স্বীয় পুত্র নো'মানকে দেওয়া উপহারের উপর সাক্ষি বানাতে চাইল, তখন তিনি-رضي الله عنه-বললেন,

((أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعِدُّوا يَوْمَ

[أَوْلَادِكُمْ]) (رواه البخاري)

“তুমি কি তোমার সমস্ত ছেলেকে অনুরূপ দিয়েছো? সে বললো, না। তিনি-رضي الله عنه-বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো।” (বুখারী) অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

((فَأَشْهَدُ عَلَى ذَلِكِ غَيْرِي فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)) (رواه أحمد)

“এর উপর আমাকে বাদ দিয়ে অন্যকে সাক্ষি বানাও, কারণ, আমি কোনো যুলুমের সাক্ষি দিই না।” (আহমদ)

একাদশ নির্দেশনাঃ আদর্শের মাধ্যমে তারবিয়াত

এমন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসমূহ শিশুর দেখা অতীব প্রয়োজন, বাস্তব জীবনে যার বাস্তবায়নের দাবী করা হয় সেই ব্যক্তিবর্গদের পক্ষ হতে, যারা তার জন্য আদর্শ, বিশেষ করে পিতা ও শিক্ষকগণ। আদর্শের মাধ্যমে তারবিয়াত দেওয়া হলো, নবী করীম-ﷺ-এর ছোটদের তারবিয়াত দেওয়ার নির্দেশনাবলীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। তাঁর পূর্ণ জীবনটাই ছিলো উন্নত নমুনায় ও আদর্শে ভরা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب ٢١]

“তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।” (আহযাব ২১) আর এই নবীজীবনী এমন কোনো গুণ ও বন্ধ ব্যাপার নয় যে, তা কেবল বিশেষ লোকরাই জানতে পারবে, বরং তা হলো একেবারে প্রকাশ্য, যা ছোট-বড় সকলে জানতে সক্ষম। আর এর চেয়ে আর কোনো তারবিয়াত পরিপূর্ণ তারবিয়াত হিসাবে গণ্য হতে পারে যে, ইবনে আব্বাস-رضী-এর মত একজন ছোট শিশু একদা মহানবীর আদর্শে রাত্রি যাপন করাকালীন দেখলেন যে, অর্ধ

রাত্রির পর তিনি-ﷺ-উঠে অযু ক'রে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে লাগলেন। এই বাস্তব কর্ম তরুণের লালন-পালন করছিল আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাস, তাঁর ভয়-ভীতি এবং তাহাজ্জুদের নামাযের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের উপর। অথচ তারবিয়াতদাতা তাঁকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি কথাও বলেননি। বর্তমানে শিল্প, গীতি এবং খেলা-ধুলার বিখ্যাত বিখ্যাত বেশিরভাগ আদর্শ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বগুলো এমন যে, তা জাতির তারবিয়াত দেওয়ার এবং কাঙ্ক্ষিত ভিত্তি গঠনের অযোগ্য। তাদের বাস্তব আচরণ এমন নয় যে, তা এই ভিত্তিকে দৃঢ় করে এবং তার প্রতি আহ্বান করে। কাজেই সনির্বন্ধ প্রয়োজন হল, নবী করীম-ﷺ-এর জীবনী থেকে তারবিয়াতের আদর্শগুলো অনুসন্ধান ক'রে সম্পূর্ণ আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে তরুণদের জন্যে তা তুলে ধরা। সেই সাথে তা যেন তাদের গ্রহণশক্তি এবং তাদের বাস্তবতার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ ও যুগের উত্তম আদর্শ হিসাবে গণ্য হয়।

সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের কিছু ভুল

সন্তান-সন্ততিদের লালন-পালনের কাজটা এমন কোনো এলোমলো ও সহজ কাজ নয় যে, প্রত্যেকেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই তা করতে পারবে। বরং এ কাজটা এমন জটিল কাজ যে, তা করতে হয় সুস্ব বিচার-বিবেচনা ও শরীয়তের নিয়ত-নীতির ভিত্তিতে। এতে প্রয়োজন ব্যক্তিগত পরিশ্রম, যার লক্ষ্য হবে ছেলেদের মঙ্গল সাধন, তাদের বুদ্ধি-বৃত্তির উন্নতি এবং তাদের অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ ও তাদের থেকে

অনিষ্টকর ও মন্দ জিনিস দূরীকরণ। অনেকে একই অনড় নিয়মে বাপ-দাদাদের অনুকরণের এবং বংশ পরম্পরায় চলে আসা প্রথার ভিত্তিতে এ তারবিয়াতের কাজ সম্পাদন করে থাকে। আর এরই ফলস্বরূপ জন্ম নেয় লালন-পালনের ব্যাপারে অনেক ভুল। ছেলেদের উপরও এর প্রভাব পড়ে। তাই তো সৃষ্টি হয় তাদের আচরণের এমন অনেক নেতিবাচক দিক, যাতে ভুগে পরিবার ও সমাজ। এই পুস্তিকায় আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভুল ও তার সঠিক চিকিৎসার কথা তুলে ধরলাম। আল্লাহই তাওফীক্বদাতা ও সাহায্যকারী।

### ১। লালন-পালনের বিষয়টাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা

অনেক পিতারা এই বিষয়টার প্রতি এতটুকুও গুরুত্ব দেয় না। সন্তানদেরকে এইভাবেই তারা লালন-পালন হতে ছেড়ে দেয়, সামান্য পরিমাণও কোনো দায়িত্ব মনে করে না। তারা কেবল দায়িত্ব মনে করে তাদের খাওয়া-পরা ও বাবস্থানের ব্যবস্থাপনাকে। আর মহান আল্লাহর (নিম্নের) বাণীকে ভুলে যায়।

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحریم ৬]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো (জাহান্নামের) অগ্নি হতে।” (তাহরীম ৬) আর আলী ইবনে আবু ত্বালিব-رضي الله عنه-বলেন, “তাদেরকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।” অনুরূপভাবে তারা নবী করীম-صلى الله عليه وسلم-এর এ হাদীসও ভুলে যায়,

(كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ رَوْحِهَا  
وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا)) [متفق عليه ١٨٢٩-١٨٩٣]

“তোমরা প্রত্যেকে অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসক একজন অভিভাবক তাকেও তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের অভিভাবক তাকেও তার অভিভাবকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের সংরক্ষণশীলা তাকেও তার অধীনস্থ বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” (বুখারী ৮৯৩-মুসলিম ১৮২৯) ইবনুল কায়েম (রাহঃ) বলেন, ‘যে নিজের ছেলেকে উপকারী জ্ঞান শিক্ষা না দিয়ে অনর্থক ছেড়ে দিল, সে তার সাথে চরম খারাপ ব্যবহার করল। অধিকাংশ ছেলেদের নষ্ট হওয়ার মূলেই হচ্ছে পিতারা, তাদের ছেলেদেরকে অনর্থক ছেড়ে দেওয়া এবং তাদেরকে দ্বীনের ফরয ও সুন্নত বিধান শিক্ষা না দেওয়া। এইভাবে তাদের ছোটতেই নষ্ট করে ফেলেছে। তাদের নিজেদেরও কোন লাভ হয়নি এবং ছেলেরা বড় হয়ে পিতাদের কোন উপকারে আসেনি। যেমন, অনেকে ছেলেকে তার অবাধ্যতার জন্য তিরস্কার করলে ছেলে বলে, বাবা! তুমি ছোটতে আমাকে অমান্য করেছ, তাই আমি বড় হয়ে তোমাকে অমান্য করছি। তুমি ছোটতে আমাকে নষ্ট করেছ, তাই আমি তোমাকে বার্ষিক্যে নষ্ট করছি।’ (তোহফাতুল মাওদুদ)

## ২। পিতাদের প্রতাপ

এই ভুল হল প্রথম ভুলের বিপরীত। এখানে পিতারা ছেলেদের প্রতিটি কার্যকলাপের উপর এমনভাবে প্রভুত্ব লাভের ভূমিকা পালন করে যে, তাদের ব্যক্তিত্বকে কিছুই মনে করে না এবং তাদের মতেরও কোনো মূল্য দেয় না। তারা তাদের মধ্যে অন্ধ অনুকরণের কিছু দৃষ্টান্ত ব্যতীত আর কিছুই দেখে না। এটা নিঃসন্দেহে এমন অনেক কর্মকাণ্ডের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অস্বীকার করা যায় না। যেমন,

১। ব্যক্তিগত দুর্বলতা এবং নিজের উপর আস্থা হারানো।

২। অপর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা ও লজ্জাবোধ রোগে আক্রান্ত হওয়া।

৩। কার্যক্ষমতার দুর্বলতা।

৪। বড় হয়ে বিপথগামী হওয়া। কারণ, তখন ছেলে অনুভব করবে যে, সে সেই শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে গেছে যা তাকে অবন্ধ রেখেছিলো। ফলে সে সমস্ত নিয়ম-শৃংখলাকে উপেক্ষা করে চলবে, যদিও সেগুলো সঠিক হয়।

৫। মানসিক ও শারীরিক রোগে আক্রান্ত হওয়া।

সঠিক তারবিয়াতের দাবী হল, ছেলেদেরকে তাদের নিজস্ব ব্যাপার-সমূহে অনেকটা স্বাধীনতা দান করা। যেমন, কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা এবং কিছু জিম্মাদারী গ্রহণ করা ইত্যাদি। আর এ সব হবে সঠিক সেই আচার-আচরণ এবং মহান শিষ্টাচারের আলোকে, যা পিতারা নিজের ছেলেদের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে

প্রতিষ্ঠিত করবে।

৩। পিতা-মাতাই সর্ব প্রথম ছেলেদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে। তাই তাদের কথার সাথে কাজের মিল থাকতে হবে। তাদেরই বহু গুণ ও আচার-আচরণ তারা (ছেলেরা) গ্রহণ করে। তাই পিতা-মাতা যদি উত্তম নৈতিকতার এবং সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হয়, তাহলে তাদের কোনো কোন ইতিবাচক গুণ ছেলেরা গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের কথা ও কাজ যদি পরস্পর বিরোধী হয়, অর্থাৎ, যদি কোনো কিছু করার নির্দেশ দেয় এবং তারা নিজেরা তার বিপরীত করে, তবে এটা ছেলেদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে। আর এই কথা ও কাজের পরস্পর বিরোধের মধ্যে হলো, পিতা ছেলেদেরকে সত্যবাদিতার নির্দেশ দিবে, কিন্তু সে মিথ্যা বলবে। তাদেরকে আমানতদারির নির্দেশ দিবে অথচ সে চুরি করবে। তাদেরকে ওয়াদা পূরণের নির্দেশ দিবে, আর সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে। তাদের নেকী ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিবে, আর সে পিতা-মাতার অবাধ্যতা করবে। তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দিবে অথচ সে তা ত্যাগ করবে। তাদেরকে সে ধূমপান করতে নিষেধ করবে, কিন্তু সে নিজে ধূমপান করবে। কথা ও কাজের এই অমিল পিতাকে ছেলেদের নজরে খাটো করে দিবে। তার কথার কোনই মূল্য দিবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

“তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো? তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না?” (সূরা বাক্বারা ৪৪)

### ৪। কঠোরতা

পিতাদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো সন্তানদের সাথে দয়া, নরম ও করুণাপূর্ণ আচরণ করা। ছোটদের সাথে আচরণ করার ব্যাপারে এটাই হলো নবী করীম-ﷺ-এর আদর্শ। আবু হুরাইরা-رضী-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- ثُمَّ قَالَ ((مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ)) [البخاري ৫৭৭৭ و مسلم ২৩১৮]

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-হাসান ইবনে আলীকে চুম্বন করলেন। এ সময় আকরা ইবনে হা-বিস তাঁর কাছে বসে ছিলেন। তিনি (আকরা) বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু তাদের কাউকে কোন দিন চুমা দেইনি। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, “যে দয়া প্রদর্শন করে না, তার প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হবে না।” (বুখারী ৫৯৯৭-মুসলিম ২৩১৮) আয়েশা (রাযী আল্লাহু আনহা) থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন,

((قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالُوا: أَتَقْبَلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقْبَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ

كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحْمَةَ) [البخاري ٥٩٩٨ مسلم ٢٣١٧]

“কিছু আরব বেদুঈন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে এলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কি আপনাদের ছোট শিশুদেরকে চুমা দেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা কিন্তু চুমা দিই না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, “আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে রহম ও অনুগ্রহ তুলে নিয়ে থাকেন, তার আমি কি মালিক হতে পারি?” (বুখারী ৫৯৯৮-মুসলিম ২৩১৭) শান্তির ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করলে তা থেকে জন্ম নিবে অস্থির চিন্তার এমন কিছু দৃষ্টান্ত যা নিজেকেই পরিচালনা করতে পারবে না, অপরকে পরিচালনা করা তো দূরের কথা। অতীতে এই ধারণাই পোষণ করা হতো যে, কঠোরতা ও কঠিন প্রহারই সন্তানদেরকে শক্তিশালী, সাহসী এবং পৌরুষ বানায়। তাদের মধ্যে দায়িত্বাদি সামাল দেওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল বানায়। তবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ধারণা ভুল। কেননা, কঠোরতা শিশুদের মধ্যে পীড়াদায়ক মানসিক প্রভাব ফেলে। তাদেরকে অব্যাহা ও কলহপ্রিয় বানায়। তাদেরকে পাক্কা বুদ্ধিসম্পন্ন স্তরে পৌঁছতে বাধা দেয় এবং সব সময় তারা নিজেদেরকে নীচ, তুচ্ছ সম্মানহীন গণ্য করে। তবে এর অর্থ এও নয় যে, আমরা একেবারে শান্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকবো। বরং কখনো কখনো শান্তি দেওয়াও উচিত। তবে এই শান্তি যেন দয়া-দাক্ষিণ্যের সীমা অতিক্রম না করে।

## ৫। অন্যায়ের ব্যাপারে শিথিলতা

যেমন কঠোরতা অস্বীকার্য, অনুরূপ অন্যায়ের ব্যাপারে শিথিলতাও অস্বীকার্য। এটাও এমন ভুল যাতে অনেক পিতা পতিত। আর এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হলো তারা এখনোও ছোট। বড় হয়ে তারা এ সব অন্যায় কাজ ছেড়ে দিবে। কিন্তু এ কথা সঠিক নয়। কারণ, যে ছোট বেলাতে কোনো কিছুর উপর অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, বড় হলে তা ত্যাগ করা তার উপর কঠিন হয়। ইবনুল কায়েম (রাহঃ) বলেন, ‘এমন পিতা কতই আছে যার ছেলে ও কলিজার টুকরো দুনিয়া ও আখেরাতে হতভাগ্য হয়েছে তার (পিতার) অবহেলা, আদব শিক্ষা না দেওয়া এবং তার চাহিদা পূরণে সহযোগিতা করার কারণে। অথচ পিতা মনে করেছে যে, সে তার সম্মান করছে, কিন্তু সে তার অসম্মান করেছে। মনে করে যে, সে তার প্রতি রহম করছে, কিন্তু সে তার উপর যুলুম করছে এবং তাকে বঞ্চিত করছে। ফলে সেও বঞ্চিত হয়েছে ছেলের উপকারিতা থেকে এবং তাকেও বঞ্চিত করছে দুনিয়া আখেরাতের অংশ থেকে। ছেলেদের বিগড়ানো ও নষ্ট হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবে, তার বেশীরভাগই পিতাদের পক্ষ থেকে হয়েছে।’ (তোহফাতুল মাওদূদ) আর ছেলেদের ব্যাপারে সব চেয়ে বড় শিথিলতা হলো, তাদেরকে নামায পড়ার ও নামাযের যত্ন নেওয়ার প্রতি উৎসাহিত না করা। অথচ নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ،

وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)) [أحمد وأبوداود وحسنه الألباني]

“তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও যখন তারা সাত বছরের হবে এবং (নামায না পড়লে) তাদেরকে মারো যখন তারা দশ বছরের হবে। আর তখন তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।” (আহমদ, আবু দাউদ। হাদীসটি হাসান)। অতএব যে পিতা মসজিদে যায় আর সন্তানদেরকে ঘুমাতে অথবা খেলতে ছেড়ে দেয়, সে ভুল করে। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه ۱۳۲]

“তুমি তোমার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দাও এবং এর উপর অবিচল থাকো।” (ত্বোহা ১৩২) অনুরূপ তার উচিত তাদেরকে গান-বাজনা শুনতে, এবং পোশাকে ও আচরণে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে এবং খ্যাতিলাভ করেছে এমন ব্যক্তিদের প্রতি (আন্তরিক) টান রাখতে নিষেধ করা, যারা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, সংস্কার কিছু করে না। তবে এ সব কাজে তার সম্বল হবে সহজ-সরল ও পরিতোষজনক ভাব, শান্ত তর্কবিতর্ক এবং ছেলেদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

৬। বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা

এটাও লালন-পালনের ভুল একটি দিক যে, বাস্তবতাকে উপেক্ষা ক’রে একঘেয়েভাবে পুরাতন জিনিসকে ধরে থাকে এবং যুগের দাবীসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন জিনিসকে গ্রহণ করে না। তাই লালন-পালনে দায়িত্বশীল ব্যক্তি সাঁতার শিখানো, তীর চালানো এবং ঘোড়সওয়ারীর শিক্ষা দেওয়ার প্রতি যত্ন নেয়। আর যুগ উপযোগী অন্যান্য দক্ষতাকে

ত্যাগ করে। যেমন, কম্পিউটার এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া। বক্তৃতা, খুৎবা এবং (কোন কিছুর) রচনা করার দক্ষতা ও আত্মরক্ষামূলক অভিনব খেলা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া। আর এরই কারণে যে অভিভাবকরা নিজেদের ছেলেদের যোগ্যতা উন্নয়নের যত্ন নেয় না, তাদের ছেলেরা তাদের অন্য সাথীদের তুলনায় যোগ্যতায় অনেক পিছিয়ে থাকে। ফলে এরা নিজেদের মধ্যে ঘাটতি অনুভব করে। তাই তারা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তাদের উন্নয়নশীল সাথীদের থেকে পৃথক থাকে।

#### ৭। ভুল স্বীকার না করা

আমাদের মধ্যে অনেকেই তার ছেলেকে ভুলবশতঃ শাস্তি দিয়ে তার প্রতি যুলুম করেছে। অনেকেই তার কোন ছেলের উপর অপবাদ দিয়েছে, অথচ সে নির্দোষ। আবার অনেকে তার কোন ছেলেকে মেরেছে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে। আর পিতা পরে জানতে পারে যে, সে তার ছেলের ব্যাপারে ভুল করেছে তা সত্ত্বেও সে না তার কাছে কোন ওজর-আপত্তি পেশ করে, আর না স্বীয় ভুল স্বীকার করে। এমন ভাব প্রকাশ করে যে, এই ছেলের না আছে কোনো অধিকার, না কোনো সম্মান, আর না আছে কোনো অনুভূতি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই আচরণ ভুল। এ থেকে জন্ম নিবে ছেলেদের মধ্যে মন্দ গুণাবলী। যেমন, অহঙ্কার-দাস্তিকতা, নিজের মতকেই বলবৎ করার মনোভাব, যদিও তা ভুল হয় এবং অব্যাহতভাবে ভুল করতে থাকা ইত্যাদি। অথচ পিতা যদি ছেলের কাছে তার ভুলের জন্য) ওজর পেশ করে, তাহলে এটা সঠিক আচরণ

বিবেচিত হবে। কারণ, এইভাবে তারবিয়াতদাতা তার ভুলকে এমন ইতিবাচক আচরণের দিকে ফিরিয়ে দিবে, যা ছেলেদের অন্তরে বড় প্রভাব ফেলবে। ফলে তাদেরকেও এই আচরণের দাবীর প্রতি আহ্বান জানাবে। যেমন, সত্যের কাছে নত হওয়া, ভুল স্বীকার করা এবং অপরের সাথে সহজ-সরল আচরণ করা।

৮। একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পিতাই হলো তার পরিবারের অভিভাবক এবং পরিচালক ও দায়িত্বশীল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক ব্যাপারে সে একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বাড়ীর লোকদেরকে সাথে না নিয়েই। কারণ, এটা ছেলেদের মধ্যে প্রভুত্ব মনোভাবের জন্ম দিবে। ফলে বড়রা ছোটদের উপর কর্তৃত্ব চালাবে এবং তাদেরকে নিজেদের থেকে পৃথক রাখবে। যেমন, তাদের পিতা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাদের সাথে করে। আমি এখানে সেল্‌ই ব্যক্তির ব্যাপারটি তুলে ধরছি যে স্বীয় গাড়ীতে করে তার স্ত্রী ও ছেলেদেরকে নিয়ে ছুটির দিনে কোথাও বের হয়। তারা জানে না যে, সে তাদেরকে নিয়ে কোথায় যাবে। কেউ যদি তাকে (কোথায় যাবে) এ কথা জিজ্ঞেস করে, তাহলে শাস্তি স্বরূপ তাদের সকলকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এবং তাদেরকে এমন বেড়াতে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করে, যার তারা বড় আশা ও উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করে। অথচ তারা তার মেজাজ সম্পর্কে জানে না। এটাই কি উত্তম নয় যে, পিতা তার ছেলেদেরকে একত্রিত করে তাদের সাথে পরামর্শ করবে যেখানে যেতে

তারা ভালোবাসে সে ব্যাপারে পরামর্শ করবে? এ রকম করলে তার ক্ষতি কি? কিন্তু কিছু মানুষ এমন আছে যাদের লক্ষ্যই হয় অপরকে দমন করা, তাদেরকে কিছুই মনে না করা এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব করা।

৯। বিশেষত্বের সম্মান না দেওয়া

আমাদের উচিত ছেলেদেরকে বিশেষত্বের সম্মান দেওয়ার কথা শিক্ষা দেওয়া। যাতে তারা তাদের নিজস্ব পরিবেশ এবং অন্য পরিবেশে বসবাস-কারীদের মধ্যে সুস্থভাবে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। ছেলেদেরকে এবং যারা বাড়ীতে আমাদের খেদমত করে তাদেরকে বিশেষ কিছু সময়ে আমাদের কাছে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়ার গুরুত্বের কথা শিক্ষা দেওয়ার প্রতি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন, বিশামের সময় এবং এমন বিশেষ সময় যখন মানুষ অন্যকে অভিনন্দন জানাতে প্রস্তুত থাকে না। তাই পিতা-মাতার উচিত হলো, ছেলেকে অপরের বিশেষত্ব ও তার সীমার অপরিহার্যতার কথা শিক্ষা দেওয়া। অতএব কারো কাছে তার বিশেষ স্থানে তার অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করবে না। অনুরূপ বন্ধ কোনো কিছু খুলবে না যা তার নয়। তাতে তা ঘরের দরজা হোক অথবা ফ্রীজ হোক কিংবা কিতাব হোক, বা খাতা হোক বা বাক্স হোক এবং তা যতই সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে পড়ে থাকুক না কেন। অনেক বাড়ী এমনও আছে যেখানে একে অপরের বিশেষত্বের প্রতি কোনো সম্মান নেই। সেই বাড়ীর ছেলেরা এলোমেলোভাবে, অসভ্যতার উপর লালিত-পালিত হয় এবং অপরের

অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে। পিতাদের উচিত ছেলেদের বিশেষত্বের সম্মান করা। তাই প্রবেশের পূর্বে দরজায় নাড়া দিবে। তাদের গুপ্ত ব্যাপার গোপন করবে। কোনো পাপের কারণে তাদেরকে দোষারোপ করবে না, বরং তাদের দোষ ঢাকবে। তাদের ভুল কম ধরবে। যদি তারা (পিতারা) এ রকম করে, তবে তারা ছেলেদেরকে অপরের বিশেষত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সফলকাম হবে।

### ১০। দূরে রাখা

কোনো কোনো পিতা ছোট ছেলেদের বড়দের মজলিসে বসাকে বড় দোষের মনে করে। তাই ছোটদের কেউ বড়দের মজলিসে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে তাকে তিরস্কার করে সেখান থেকে তাকে দূর করা হয়। সন্দেহ নেই যে ছোটদেরকে কখনো কখনো বড়দের মজলিসে বসতে অনুমতি দেওয়া উচিত। যাতে তাদের থেকে কিছু গ্রহণ করে। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা ও উপকারিতা অর্জন করে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট কিছু পানীয় আনা হল। তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিলো একটি বালক। বাম দিকে ছিল কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। তিনি বালকটিকে বললেন,

((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أُؤْتِرُ

بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ فَتَلَّهٗ رَسُولُ اللَّهِ-ﷺ- فِي يَدِهِ)) [البخاري وسلم]

“তুমি কি অনুমতি দিচ্ছ যে, এগুলো বয়োজ্যেষ্ঠদের দিয়ে দিই? বালকটি

বললো, না, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল। আপনার নিকট প্রাপ্য আমার অংশের উপর আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিবো না। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তা তার হাতে রেখে দিলেন।” (বুখারী ২৩৬৬-মুসলিম ২০৩০) তিনি কত মহান পথপ্রদর্শক, তারবিয়াতদাতা এবং শিক্ষক ছিলেন। প্রত্যেক যুগ ও স্থানের এবং সর্ব শ্রেণীর মানবতা তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী বিধান ছোট ছেলেদেরকে বড়দের সংস্রবে থাকতে, তাদের সাথে মজলিসে, মসজিদে, অনুষ্ঠানে এবং সফরে ও ক্লাবে বসতে নিষেধ করেন নি। আর এটা এই জন্য যে, যাতে তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু অর্জন করে। তাদের সাথে কাজকর্মে শরীক হয় এবং দায়িত্ব পালনের শিক্ষা গ্রহণ করে। ছোটদেরকে বড়দের সংস্পর্শ থেকে দূর করা হলো নেতিবাচক নিয়ম-পদ্ধতি যা কার্যকর নয়। ছোটদেরকে আপসে ছেড়ে দিলে তারা মন্দ কার্যকলাপ ব্যতীত কিছুই শিখবে না। শয়তান তাদেরকে বিপথগামী করবে। ফলে তারা বড়দের সাথে মিশে বড় কার্যকলাপ শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে অন্যায-অনাচার শিখবে।

সন্তান-সন্ততির তারবিয়াতের ১৩০টি পদ্ধতি

শিশুদের তারবিয়াত দেওয়া এমন এক দক্ষতা, যা বহু স্বল্প সংখ্যক মানুষই অর্জন করতে সক্ষম হয়। এর উপর অনেক বই-পুস্তকও লিখা হয়। যার কোনটা বিস্তারিত, আবার কোনটা সংক্ষিপ্ত। আমি এই কিতাব-গুলোর সার কথা ফলপ্রসূ ও গবেষনামূলক এমন কিছু বাক্যের মাধ্যমে

উল্লেখ করলাম, যা থেকে পিতারা ও তারবিয়াতদাতারা তাদের শিশুদেরকে সঠিক তারবিয়াত দেওয়ার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী নয়।

আক্বীদা (বিশ্বাস)

১। তোমার সন্তানকে তাওহীদের বাক্য এবং তাতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক যে দিক রয়েছে তার শিক্ষা দাও। ‘লা-ইলাহা’ এতে আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত উপাস্যতার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। ‘ইল্লাল্লা-হ’ এতে কেবল আল্লাহর উপাস্যতাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

২। তাকে শিক্ষা দাও কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذريات ٥٦]

“আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে” (যারিয়াত ৫৬) এর সাথে তাকে ইবাদতের সর্বব্যাপী অর্থও বলে দাও।

৩। খুব বেশী তাকে জাহান্নামের, শাস্তির এবং আল্লাহর ক্রোধের ও তাঁর শাস্তির ভয় দেখাবে না, যাতে আল্লাহর স্মরণ তার মনে এই ভয়ানক আকারে বসে না যায়।

৪। এমন তার মনোভাব তৈরী করো যে, সে যেন আল্লাহকে সব থেকে বেশী ভালোবাসে। কারণ, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে রুজি দেন। আমাদেরকে খাওয়ান ও পরান এবং তিনিই আমাদেরকে মুসলিম বানিয়েছেন।

৫। নির্জনে কোনো ভুল কাজ করার ব্যাপারে তাকে সতর্ক কর। কারণ,

আল্লাহ তাকে সর্বাবস্থায় দেখেন।

৬। এমন বাক্যগুলো বেশী বেশী তুলে ধরো যাতে আল্লাহর যিকর আছে। যেমন, পানাহার এবং প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় 'বিসমিল্লা-হ' বলা। পানাহার শেষে 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলা। আর বিস্ময়কর কিছু ঘটলে 'সুবহানাল্লা-হ' বলা। এই ধরনের আরো বাক্য।

৭। মহান রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি তোমার ছেলের ভালোবাসার জন্ম দাও। তাঁর পবিত্র গুণাবলীর কিছু শিক্ষা দিয়ে এবং তাঁর সামনে নবী জীবনীর কিছু ঘটনাদি পাঠ করে। অনুরূপ যখনই তাঁর নাম আসবে, তখন তাঁর উপর দরুদ পাঠ করার কথা শিক্ষা দিয়ে।

৮। ভাগ্য সংক্রান্ত বিশ্বাস তার মনে সুদৃঢ়ভাবে ঢুকিয়ে দাও। অতএব আল্লাহ যা চান, তা-ই হবে এবং তিনি যা চান না, তা হবে না।

৯। ঈমানের ছয়টি রুকনের কথা তোমার ছেলেকে শিক্ষিয়ে দাও।

১০। তাকে আক্বীদা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন কর। যেমন, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? আমাদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? আমাদেরকে কে রুজি দেন, কে পানাহার করান এবং কে আরোগ্য দান করেন? তাওহীদ কত প্রকারের? শির্ক, কুফরী এবং নিফাক কাকে বলে? মুশরিক, কাফের এবং মুনাফেকদের পরিণাম কি হবে? ইত্যাদি ইবাদত।

১১। তোমার ছেলেকে ইসলামের পাঁচটি রুকনের কথা শিখিয়ে দাও।

১২। ছেলেকে নামায পড়তে অভ্যস্ত করানো। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ))

“তোমাদের সন্তানদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স হবে সাত বছর। আর তাদেরকে তার (নামায না পড়ার) জন্য প্রহার কর, যখন তাদের বয়স হবে দশ বছর।”

১৩। তোমার ছেলেকে সাথে করে মসজিদ নিয়ে যাও এবং তাকে অযু করার তরীকা শিক্ষা দাও।

১৪। তাকে মসজিদের আদব, সম্মান এবং পবিত্রতা রক্ষা করার কথা শিক্ষা দাও।

১৫। তাকে রোযা রাখার অনুশীলন করাও যাতে সে বড় হয়ে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

১৬। তোমার শিশুকে তার সাধ্যানুযায়ী কুরআন, হাদীস এবং সহীহ-শুদ্ধ দুআ-যিকর মুখস্থ করার প্রতি অনুপ্রাণিত কর।

১৭। তাকে পুরস্কৃত করো যখনই সে মুখস্থে আগে বাড়বে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন, আমার পিতাকে আমাকে বললেন, হে বৎস, হাদীস শিক্ষা কর। যখনই তুমি কোনো হাদীস শুনাবে ও মুখস্থ করবে, তখনই তুমি এক দিরহাম পাবে। তিনি (ইবরাহীম ইবনে আদহাম) বলেন, এইভাবে হাদীস সংগ্রহ করি।

১৮। খুব বেশী মুখস্থ ও অধ্যয়ন করিয়ে তুমি তোমার ছেলেকে ক্লান্ত করে তুলো না। যাতে সে এটাকে শাস্তি মনে ক’রে কুরআন মুখস্থ করাকে ঘৃণা না করে।

১৯। মনে রেখো তুমি তোমার সন্তানদের জন্য আদর্শ। অতএব তুমি যদি ইবাদতে অবহেলা কর অথবা শিথিলতা অবলম্বন করো এবং তা সম্পাদন করাকে অতীব ভারী মনে করো, তাহলে এ ব্যাপারে তোমার এ প্রভাব তোমার ছেলেদের উপরেও পড়বে। তারাও ইবাদতকে ভারী মনে করবে এমনকি তা থেকে পালাতেও পারে।

২০। তোমার ছেলেকে দান-খয়রাত করার শিক্ষা দাও। আর তা এইভাবে যে, কখনো তুমি তাকে দেখিয়ে সাদকা করো অথবা ফকীর ও ভিক্ষুককে সাদকা করার জন্য তাকে কিছু দাও। আর উত্তম হল তাকে তার জমা করা নিজস্ব মাল থেকে সাদকা করার উৎসাহ দাও।

### নৈতিকতা

২১। যদি চাও যে তোমার ছেলে সত্যবাদী হোক, তবে তার মনে ভয় ঢুকায়ো না।

২২। তুমি আগে সত্যবাদী হও, তাহলে তোমার ছেলে তোমার থেকে সত্য বলা শিখবে।

২৩। তাকে ব্যাখা ক'রে শুন্যও সত্যবাদিতা ও বিশস্ততার ফযীলতের কথা।

২৪। তোমার ছেলের অজানতে তার আমানতের পরীক্ষা নাও।

২৫। ছেলেকে শিক্ষা দাও ধৈর্য ধরতে এবং দ্রুততা না করতে। আর এটা তুমি করতে পারো তাকে রোযার অনুশীলন করিয়ে অথবা এমন কিছু কর্ম করিয়ে যাতে ধৈর্য ধীরস্থিরতার প্রয়োজন হয়।

২৬। তুমি তোমার ছেলেদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর। কারণ, এটাই

হলো উত্তম মাধ্যম তাকে সুবিচারের চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার।

২৭। তোমার ছেলেকে (অপরকে নিজের উপর)প্রাধান্য দেওয়ার চরিত্র শিক্ষা দাও তোমার বাস্তব কিছু কর্মের মাধ্যমে অথবা (অপরকে) প্রাধান্য দেওয়া ফযীলত সংবলিত ঘটনাবলী তুলে ধরার মাধ্যমে।

২৮। তোমার ছেলের সামনে তুলে ধরো প্রতারণার, চুরির এবং মিথ্যা বলার নেতীবাচক দিকগুলো।

২৯। কোনো ব্যাপারে তোমার ছেলে সাহসিকতা প্রকাশ করলে এতে তার প্রশংসা কর এবং তাকে পুরস্কৃত কর। আর তাকে বলে দাও যে, বাহাদুরি হলো এই যে, তুমি তা-ই করো যা সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

৩০। তুমি এত কঠোর হয়ো না যে, তার মধ্যে ভয়, মিথ্যা এবং ভীরুতার জন্ম নেয়।

৩১। বিনয়ী, নম্রতা এবং দাস্তিকতা ত্যাগ করার নৈতিকতার প্রতি তার ভালোবাসা সৃষ্টি কর।

৩২। তাকে জানিয়ে দাও যে, মানুষের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচিত হবে আল্লাহভীরুতা এবং নেক আমলের ভিত্তিতে। বংশ, আভিজাত্য এবং ধন-সম্পদের ভিত্তিতে নয়।

৩৩। তাকে জানিয়ে দাও যে, যুলুম হলো যাবতীয় অন্যায়ের কেন্দ্রস্থল। আর সীমালঙ্ঘনকারীকে তার সীমালঙ্ঘনই পরাভূত করে এবং খিয়ানত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

৩৪। তাকে এমন জিনিসগুলোর মধ্যে পার্থক্য শিখিয়ে দাও যা হয়তো তার কাছে উহ্য। যেমন বাহাদুরি ও হঠকারীতার মধ্যে পার্থক্য। লজ্জা ও

হতভঙ্গের মধ্যে পার্থক্য। নম্র ও নীচ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য এবং বুদ্ধি ও ধোঁকা দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য।

৩৫। তোমার সন্তানদেরকে দানশীল হতে অভ্যস্ত করো। অতএব তুমি তোমার বাড়ীতে দানশীল হও এবং অপরের জন্য কল্যাণ পেশ করো।

৩৬। কখনোও অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না বিশেষ করে ছেলেদের সাথে কৃত অঙ্গীকার। এতে তাদের অন্তরে অঙ্গীকার পূরণের ফযীলতের কথা সুদৃঢ় হয়ে যাবে।

ব্যবহার ও আদব

৩৭। তোমার ছেলেদেরকে সালাম দাও।

৩৮। ছেলেদের সামনে লজ্জাস্থান খুলার ব্যাপারে অযত্নবান হয়ো না।

৩৯। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করো।

৪০। তোমার ছেলেদেরকে প্রতিবেশীর অধিকার এবং তাকে কষ্ট দেওয়ার ভয়াবহতার কথা শিখিয়ে দাও।

৪১। তোমার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। আত্মীয়তা সম্পর্ক জুড়ো এবং এ সব কাজে ছেলেদেরকেও সাথে রাখো।

৪২। তোমার ছেলেদেরকে জানিয়ে দাও যে, মানুষ এমন ভদ্র ছেলেদের ভালোবাসে যারা অপরকে কষ্ট দেয় না।

৪৩। তোমার ছেলের জন্য একটি চিঠি লিখো যাতে থাকবে কিছু আদব, নসীহত ও উপদেশ।

৪৪। ছেলেদেরকে পরিক্ষার করে জানিয়ে দাও যে, কিছু আচার-ব্যবহার এমন আছে যা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার্য এবং তার কারণও বলে দাও।

৪৫। তুমি তোমার ছেলেদের সাথে বসে প্রত্যেক বৈঠকে নবী করীম-  
ﷺ-এর (শিক্ষা দেওয়া) আদবসমূহ থেকে কোন কোনো আদব পড়তে  
বলো এবং জিজ্ঞেস করো যে, এ থেকে তারা কি উপকারিতা অর্জন  
করলো। তোমার ছেলেকেই পড়তে দাও আর তুমি শোন।

৪৬। ছেলেকে নসীহত কর গোপনে। কারো সামনে তাকে শাস্তি দিও না।

৪৭। তিরস্কার কম করতে চেষ্টা করবে।

৪৮। ছেলের কাছে যাওয়ার পূর্বে তার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি নাও।  
কারণ, এটা তাকে অনুমতি নেওয়ার কথা শিক্ষা দেওয়ার সর্বোত্তম পস্থা।

৪৯। এ রকম আশা করো না যে, তুমি যা চাও, তা সে প্রথমবারেই  
বুঝে নিবে।

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾

“তোমার পরিবারকে নামাযের নির্দেশ দাও এবং এর উপর ধৈর্য ধারণ  
করো।” (সূরা ত্বহা ১৩২)

৫০। তাকে খাবার পূর্বে সশব্দে ‘বিসমিল্লা-হ’ এবং খাবার পর ‘আল  
হামদুলিল্লা-হ’ বলা শিক্ষা দেওয়ার কথা ভুলে যেও না।

৫১। ছেলেদের কোনো কোনো ভুলের ব্যাপারে নাজানার ভান কর। আর  
তার ভুলগুলো তুমি তোমার অন্তরে জমা করে রেখো না।

৫২। তুমি কোনো ভুল করলে ছেলের কাছে ওজর পেশ কর।

৫৩। তোমার ছেলেকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি উৎসাহ দান কর এবং তাকে  
বলো যে, আমি জানি তুমি (অন্যদের) তুলনায় বেশী উন্নত। তুমি এটা  
করার ক্ষমতা রাখো।

- ৫৪। তোমার ছেলেদের সাথে সামান্য বিবাদও করো।
- ৫৫। তোমার ছেলের কোনো কথা অথবা তার কোনো আচরণের জন্য উপহাস করো না।
- ৫৬। তোমার ছেলেকে স্বাগতম, অভিনন্দন এবং সৌজন্যতা প্রকাশের ভাষা শিক্ষা দাও।
- ৫৭। তোমার ছেলেকে পথনির্দেশনার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।
- ৫৮। ছেলেকে কোনো কাজের প্রতি উৎসাহ দানের জন্য সব সময় প্রলুব্ধকারী পার্থিব বস্তুর লোভ দেখানো ঠিক নয়। কারণ, এটা পার্থিব বস্তুর সামনে তার ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করে তুলবে।
- ৫৯। তোমার ছেলেকে তোমার এক নম্বর বন্ধু মনে কর।

### শরীর চর্চার তারবিয়াত

- ৬০। খেলার জন্য তোমার ছেলেকে যথেষ্ট সময় দাও।
- ৬১। ফলপ্রসূ খেলার সরঞ্জাম যথেষ্ট পরিমাণে তোমার ছেলেদের জন্য ব্যবস্থা করো।
- ৬২। তাকেই তার পছন্দ মত কিছু খেলার সরঞ্জাম নির্বাচন করতে দাও।
- ৬৩। তোমার ছেলেকে সাঁতার, দৌড়াদৌড়ি এবং শক্তিমূলক কিছু খেলার শিক্ষা দাও।
- ৬৪। কোনো কোনো খেলায় কখনো কখনো তাকেই তোমার উপর জয়ী হতে দাও।
- ৬৫। তোমার ছেলের জন্য সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করো।

৬৬। তোমার ছেলের নিয়মে খাদ্য গ্রহণের প্রতি যত্নবান হও।

৬৭। খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক করো।

৬৮। খাদ্য গ্রহণ করার সময় তার কোনো ভুল ধরো না।

৬৯। যে খাবার তোমার ছেলে সব সময় খেতে ভালোবাসে সেই খাবারই তৈরী করো।

### আধ্যাত্মিক তারবিয়াত

৭০। মনোযোগ দিয়ে তোমার ছেলের কথা শুনো এবং তার প্রতিটি কথার গুরুত্ব দাও।

৭১। তোমার ছেলেকে তার নিজের সমস্যা নিজেকেই সমাধান করতে দাও। তবে তুমি তার সাহায্য এমনভাবে করতে পারো যেন সে টের না পায়।

৭২। তোমার ছেলের সম্মান কর এবং কোনো কাজে উত্তীর্ণ হলে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

৭৩। তোমার ছেলেকে শপথ গ্রহণের মুখাপেক্ষী বানাও না, বরং তাকে বল যে, কসম ছাড়াই আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

৭৪। ভয় দেখনো ও ধমকমূলক কথা-বার্তা থেকে বেঁচে থাক।

৭৫। তোমার ছেলের মধ্যে এই অনুভূতি যেন সৃষ্টি না হয় যে, তুমি মন্দ ও নির্বোধ মানুষ।

৭৬। তোমার ছেলের বেশী প্রশ্ন করার কারণে বিরোক্তি বোধ করো না,

বরং তার প্রতিটি প্রশ্নের সরল ও সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর।

৭৭। ছেলেকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে তার মধ্যে ভালোবাসার ও প্রেম-প্রীতির অনুভূতি জন্মাও।

৭৮। কোনো কোনো ব্যাপারে তোমার ছেলের সাথে পরামর্শ কর এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী আমল কর।

৭৯। ছেলের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি কর যে, (কোন ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে।

সামাজিকতার তারবিয়াত

৮০। বিশেষভাবে গ্রীষ্মকালে আয়োজিত শিক্ষা শিবিরে, কুরআন মুখস্থ করার দারসে ইলমী প্রতিযোগিতায় এবং জনসেবামূলক কাজের অনুশীলন সহ আরো অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক তৎপরতায় (শরীক হওয়ার জন্য) তোমার ছেলেদের নাম লিপিবদ্ধ কর।

৮১। তোমার ছেলেকেই অতিথিদের আতিথ্য করতে দাও। যেমন, তাদের জন্য চা, কফি এবং ফলাদি পেশ করা ইত্যাদি।

৮২। তুমি তোমার ছেলেকে মুবারকবাদ দাও যখন সে তোমার কাছে প্রবশে করে তোমার বন্ধুদের সাথে থাকা অবস্থায়।

৮৩। তোমার ছেলেকে মসজিদের সমাজ কল্যাণমূলক কার্যকলাপে শরীক হতে দাও। যেমন, বিধবা ও ইয়াতীমদের জন্য চাঁদা তুলার বাক্স নিয়ে এ কাজে শরীক হওয়া।

৮৪। তোমার ছেলেকে অভ্যস্ত করো বেচাকেনা ও হালাল উপার্জন করতে।

৮৫। তোমার ছেলের এমন মনোভাব তৈরী করো যে, যেন তার মধ্যে কখনো কখনো অন্যের দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং তাদের থেকে তা লাঘব করার প্রচেষ্টা নেয়।

৮৬। তবে তাকে বিশ্বের চিন্তা মাথায় করে বয়ে বেড়াতে দিও না।

৮৭। তাকে তার সামাজিক কাজের ফল দেখতে দাও।

৮৮। তোমার ছেলেকে কোনো কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য পাঠাও এবং তার প্রতি তোমার বিশ্বস্ততার অনুভূতি জন্মাও।

৮৯। তাকে তার পছন্দ মত বন্ধু নির্বাচন করতে বাধা দিও না। তবে তার অজানতে তুমি তাকে তোমার পছন্দ মত বন্ধু নির্বাচন করতেও পার

স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় তারবিয়াত

৯০। তোমার ছেলের (শারীরিক) সুস্থতার যত্ন নাও।

৯১। পলিওগুলো সঠিক সময়ে দেওয়ার ব্যাপারে অবহেলা করো না।

৯২। তাকে ঔষধ দেওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। তাকে তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ দিবে।

৯৩। তোমার ছেলেকে শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক করাও।

৯৪। ছেলেদেরকে সকাল সকাল ঘুমাতে এবং সকাল সকাল জাগতে অভ্যস্ত করো।

৯৫। তোমার ছেলে যেন তার শরীরের, দাঁতের এবং কাপড়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্ন নেয় তার প্রতি খেয়াল রাখো।

৯৬। রোগের ভীষণ আকার ধারণ করার অপেক্ষা করো না।

৯৭। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের থেকে তুমি ছেলেদেরকে দূরে রাখো।

৯৮। তোমার ছেলে যেন টের না পায় যে তার রোগ বড়ই বিপদজনক।

৯৯। আল্লাহরই শরণাপন্ন হও। কারণ, সমস্ত রোগের আরোগ্য তাঁর হাতে।

সাংস্কৃতিক তারবিয়াত

১০০। তোমার ছেলেকে কোনো কোনো ধাঁধা (কৌতুহলজনক) প্রশ্নও কর।

১০১। তাকে মতপ্রকাশমূলক বিষয়ে কিছু লিখতে বলো।

১০২। তোমার ছেলে যা লিখে তা সব সময় পড়তে চেষ্টা করো।

১০৩। (পড়ার সময়) তার প্রতিটি ব্যাকারণ অথবা ভাষা সম্পর্কীয় ভুলে থেমে যেও না।

১০৪। ছেলেকে পড়ার প্রতি উৎসাহিত করো।

১০৫। সে যে বই ও কাহিনী পড়তে চায় তা তাকেই নির্বাচন করতে দাও।

১০৬। তোমার ছেলের সাথে পড়াতে তুমিও কিছু অংশ গ্রহণ করো।

১০৭। বুদ্ধি বৃদ্ধি হয় এমন কিছু খেলার সরঞ্জাম তোমার ছেলেদের জন্য উপস্থিত কর।

১০৮। ছেলেকে তার পড়াশুনায় সফলতা অর্জনের উৎসাহ দাও।

১০৯। তার পড়াশুনার সফলতার পথে বাধা হয় এমন সমস্ত জিনিসের উপর তাকে জয়ী করে তুলো।

১১০। ছেলেকে পূর্বের ও পরের কবিদের কিছু কবিতা এবং তত্ত্বমূলক তাঁদের কিছু কথাবার্তা মুখস্থ করতে অনুপ্রাণিত কোর।

- ১১১। তাকে কিছু ফলপ্রসূ প্রবাদবাক্য মুখস্থ করার প্রতি উৎসাহিত কর।
- ১১২। তোমার ছেলেকে খুংবা দেওয়ার ও বৎতুতা করার দক্ষতা অবলম্বন করতে অভ্যস্ত করো।
- ১১৩। তাকে যুক্তিতর্ক ও প্রবর্তনার কলাকৌশল শিক্ষা দাও।
- ১১৪। ব্যক্তিগত যোগ্যতার উন্নতিকল্পে আয়োজিত বিশেষ ক্লাসগুলোতে তাকে শরীক হতে দাও।
- ১১৫। প্রসিদ্ধ বিদেশী ভাষা ভালোভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি তাকে উৎসাহিত করো। প্রতিদান ও শাস্তি।
- ১১৬। প্রতিদান ও শাস্তির নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন করো।
- ১১৭। না সব সময় প্রতিদান দিও, আর না সব সময় শাস্তি দিও।
- ১১৮। প্রতিদান রকমারি যেন হয়। সব সময় টাকা-পয়সাই যেন না হয়। বরং কখনো হবে (কোথাও) ভ্রমণে যাওয়ার প্রতিদান অথবা কম্পিউটারে খেলতে দেওয়ার প্রতিদান কিংবা কোনো হাদিয়া বা বন্ধুর সাথে বেড়াতে যাওয়ার প্রতিদান।
- ১১৯। অনুরূপ শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারেও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করো। কেবল মারাটাই যেন তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি না হয়। এ ছাড়া আরো পদ্ধতিও রয়েছে। যেমন, ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকানো, কথার মাধ্যমে ধমক, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাক্যালাপ না করা, তার ব্যয় বাবদ প্রতিদিন যা দেওয়া হয় তা থেকে কিছু কেটে নেওয়া অথবা সাপ্তাহিক ভ্রমণ থেকে বঞ্চিত করা।

১২০। মনে রেখো, উপযুক্ত শাস্তি হলো সেই শাস্তি, যা ভুলের পুনরাবৃত্তি হতে দেয় না এবং সঠিকতার দিকে নিয়ে যায়।

১২১। মনে রেখো যে, নবী করীম-ﷺ-কখনোও কোনো শিশুকে মারেননি।

১২২। প্রাথমিক কোন ভুলের কারণে শাস্তি দিও না।

১২৩। শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর হয়ো না।

১২৪। ছেলেকে শাস্তি দিলে তার কারণও বলে দিও।

১২৫। ছেলের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি যেন না হয় যে, তুমি তাকে শাস্তি দিয়ে বড় মজা পাও অথবা তার প্রতি সামান্য কিছু বিদ্বেষও তুমি পোষণ করো।

১২৬। লোকের সামনে এবং ক্রোধের সময় তুমি তোমার ছেলেকে মারধর করো না।

১২৭। ছেলের মুখমুহুরে মেরো না এবং তার উপর প্রয়োজনের বেশী হাত তুলো না। যাতে তার পীড়ন যেন দ্বিগুণ বেড়ে না যায়।

১২৮। না মারার অঙ্গীকার করার পর আর মেরো না। যাতে তোমার উপর তার আস্থা যেন হারিয়ে না যায়।

১২৯। তোমার ছেলের মধ্যে এই অনুভূতির জন্ম দাও যে, তুমি তাকে তার মঙ্গলের জন্যই শাস্তি দিচ্ছে এবং তার প্রতি তোমার ভালোবাসার জন্য এ কাজ তুমি করছো।

১৩০। তাকে জানিয়ে দাও যে, শাস্তি কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়, বরং আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

আল্লাহর কাছে হেদায়াত, তাওফীক এবং সঠিকতা কামনা করছি।

## সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	সন্তান প্রতিপালনে মহানবী-ﷺ-এর পথনির্দেশিকা
৭	চিকিৎসার চেয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম
৮	পরস্পরকে আলোচনার সুযোগ দেওয়া
১১	মধ্যমপন্থী কৈফিয়াত তলব
১২	আত্মনির্ভরতার সুযোগ দেওয়া
১৫	উত্তম নৈতিকতার প্রতি দিকনির্দেশনা
১৭	উত্তম নৈতিকতার প্রতিদান দেওয়া
১৮	সন্তানদের মনে ভালোবাসার অবুভূতি জন্মানো
২১	ছেলেদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা
২৪	আদর্শের মাধ্যমে তারবিয়াত
২৫	সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের কিছু ভুল
২৬	লালন-পালনের বিষয়টাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা
২৮	পিতাদের প্রতাপ
২৯	কথার সাথে কাজের অমিল
৩০	কঠোরতা
৩২	অন্যায়ের ব্যাপারে শিথিলতা
৩৩	বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা
৩৫	একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
৩৬	বিশেষত্বের সম্মান না দেওয়া
৩৮	সন্তান-সন্ততির তারবিয়াতের ১৩০টি পদ্ধতি